সংবাদ

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা 77 কলাম 2

রাবিতে ৩২ বছরে ২৯ খুন বিচার হয়নি একটিরও

সন্তানহারা বাবা-মার মনের ক্ষত শুকায়নি

সুব্রতদাস রাজশাহী

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনকে আলোকিত করার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পৃক্ততায় প্রায় প্রতি বছরই প্রাণ হারাচ্ছেন কোন না কোন শিক্ষার্থী।

আশির দশকের পর থেকে বিদ্যাপীঠে রাজনৈতিক সহিংসতায় লাশ হয়েছেন ২৯ শিক্ষার্থী। এজন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর নৈতিক অবক্ষয়কেই দায়ী করছেন শিক্ষক ও ছাত্ররা। তাছাড়া হত্যাকাণ্ডগুলোর বিচারহীনতাও সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে বলে মনে করেন তারা।

ছাত্র নেতাদের মতে, মূলত আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময় এসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। গত পাঁচ বছরে ছয়জন শিক্ষার্থী মারা গেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

গত ৩২ বছরে নিহত ২৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রলীগের সাতজন, ছাত্রশিবিরের ১৫ জন, ছাত্রদলের চারজন, ছাত্র মৈত্রীর দুইজন এবং ছাত্র ইউনিয়নের এক জন রয়েছেন। সর্বশেষ, গত শুক্রবার হলে নিজ কক্ষে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন ছাত্রলীগের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল শাখার সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী আকন্দ। ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি করছেন ছাত্রলীগ নেতারা। তবে শিবির বলছে, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই রুস্তম খুন হয়েছেন।

> **ছাত্রলীগের ৭, শিবিরের ১৫, ছাত্রদলের ৪, ছাত্র মৈত্রীর ২ এবং ছাত্র ইউনিয়নের ১ জন খুন হয়েছেন**

২০১৩ সালের নভেম্বর গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ছাত্রশিবিরের হামলায় নিহত হন ছাত্রলীগের শাহ মখদুম হল শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন। ২০১২ সালের ১৬ জুলাই ছাত্রলীগ কর্মী আব্দুল্লাহ আল হাসান সোহেল নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডটি ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল। ২০১০ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে খাবারের টোকেন নিয়ে নিজ দলের কোন্দলে প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগ কর্মী নাসরুল্লাহ নাসিমকে শাহ মখদুম হলের দ্বিতীয় তলা থেকে ফেলে দেন। নয় দিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। একই বছর ৮ ফেব্রুয়ারি শিবিরের হামলায় নিহত হন ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন। এর আগের বছর ২০০৯ সালের ১৩ মার্চ ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত হন শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান নোমানী। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটের সামনে ছাত্রদলের হামলায় নিহত হন শিবিরকর্মী সাইফুদ্দিন। ১৯৯৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে শিবিরকর্মীরা কুপিয়ে হত্যা করে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের (জাসাস) বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ আমানকে। ১৯৯৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি শিবির কর্মীরা বাস থেকে নামিয়ে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে ছাত্র মৈত্রী নেতা দেবাশীষ ভট্টাচার্য রূপমকে। ১৯৯৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর শিবিরকর্মীদের হাতে খুন হন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র মৈত্রীর নেতা জুবায়ের হোসেন রিমু। ১৯৯৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হল দখলকে কেন্দ্র করে শিবিরের হামলায় নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের কর্মী বিশ্বজিৎ ও নতুন। শিবিরের ওই হামলায় গুরুতর আহত ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী তপন পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ১৯৯২ সালের ১৭ মার্চ শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান জাসদ ছাত্রলীগের কর্মী ইয়াসির আরাফাত। ১৯৮৯ সালের ১৮ এপ্রিল ছাত্রসংঘর্ষে মারা যান শিবিরকর্মী শফিকুল ইসলাম। ১৯৮৮ সালের ১৭ নভেম্বর ছাত্র সংঘর্ষে নিহত হন শিবিরকর্মী আসলাম হোসেন। এই ঘটনার জের ধরে পরদিন আরেক দফা সংঘর্ষে নিহত হন শিবিরের আরেক কর্মী আজগর আলী। ১৯৮২ সালের ১১ মার্চ ক্যাম্পাসে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষে দলটির চারজন কর্মী এবং ছাত্রলীগ নেতা মীর মোশতাক এলাহী মারা যান।

এছাড়া, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষে ১৯৯০ সালের ২২ জুন শিবিরকর্মী খলিলুর রহমান, ১৯৯২ সালের ৭ মে আজিবর রহমান, ১৯৯৩ সালের ১৭ জানুয়ারি মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি মুস্তাফিজুর রহমান ও রবিউল ইসলাম, ১৯৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইসমাইল হোসেন নিহত হন।

'ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি উচ্চশিক্ষা অর্জন করে সনদ পাওয়ার জন্য। লাশ পাওয়ার জন্য নয়' কথাগুলো বলেন ২০১০ সালে শিবিরের হামলায় নিহত ছাত্রলীগ নেতা ফারুক হোসেনের মা হাসনা বেগম। তিনি বলেন, 'যার সন্তান হারায় সে বুঝে সন্তান হারানোর কষ্টটা কতটা তীব্র। ফারুককে হারিয়ে আমরা বুঝেছি তার কষ্টটা কেমন।

নিহত ছাত্রলীগ নেতা নাসিরুল্লাহ নাসিমের বাবা মোসলেম উদ্দিন মনে করেন ছাত্র রাজনীতির এই ভয়ানক পরিবেশ লেখাপড়ার জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এ থেকে পরিত্রাণ দরকার।

ক্ষমতার লোভের কারণে ছাত্র রাজনীতির 'নৈতিক স্খলন' ঘটেছে মন্তব্য করে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল তুহিন বলেন, 'এ কারণেই বিভিন্ন সময় নিজদলীয় কিংবা প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের মধ্যে খুনাখুনির ঘটনা ঘটছে।

ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত রেজা আশিকের মতে, যখন যে দল সরকারে আসে তখন ওই দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। এর জেরে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপরাজনীতির ফসল।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আয়াতুল্লাহ খোমেনী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীনতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলো যথেষ্ট কঠোর না হওয়ায় ছাত্র জীবনেই অনেক শিক্ষার্থী সন্ত্রাসী হয়ে যাচ্ছে। আমরা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এন্তাজুল হক সাংবাদিকদের বলেন, 'গত প্রায় ৪০ বছর ধরে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছি। এ সময়ে কোন ছাত্র হত্যার বিচার হতে দেখিনি।'